অভিনয় : মূকাভিনয়

অসিত বসু

মূকাভিনয় কথাটাকে এখানে খুব সংকীর্ণ অর্থে ধরি। সত্যিকথা বলতে কি আমাদের এখানে মূকাভিনয় বলতে একক প্যান্টোমাইমকে বোঝায়। 'প্যান্টোমাইম' মূকাভিনয় সাইলেন্ট অ্যাকটিং-এর একটি অংশ। যেমন –নৃত্যের মধ্যে ভরত নাট্যম আছে, কথাকলি আছে, কুচি পুরি আছে, মনিপুরি আছে ইত্যাদি। এখানে প্রত্যেকটি নৃত্যেরই বিশিষ্ট ভঙ্গি আছে, মেক আপ আছে, বিশিষ্ট কতগুলি মুদ্রা আছে। তেমনি মূকাভিনয়কে দেখা। Mime শব্দ থেকে এসেছে এই প্যান্টোমাইম। 'মাইম' ব্যাপকার্থে –মূকাভিনয়। যা থেকে 'মাইমেসিস' শব্দটি পাই অভিনয় শাস্ত্রে। 'মিমিক্রি' অর্থাৎ অনুকরণ–শাস্ত্রীয় নাট্যাভিনয়ের একটি বিশেষ অংশ। প্রসঙ্গত মনে পড়ছে ভরত নাট্যশাস্ত্রের কথা। ভরত নাট্যশাস্ত্রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম অভিনয় সংজ্ঞা আছে। শুধু তাই নয় আমি বলবো সবথেকে সাইন্টিফিক বা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা সেখানে আছে। ভরত বলেছেন – অবস্থার অনুকার বা অনুকৃতি অর্থাৎ মানুষের নানা রকম মানসিক অবস্থান এবং তজ্জনিত তার প্রকাশ্য বিভিন্ন ভাব বা পরিবেশের অনুকৃতি হচ্ছে অভিনয়। তিনি বলেছেন অভিনয় চার রকমের হয়। যেমন –আঙ্গিক, বাচিক, আহার্য এবং সাত্ত্বিক। মজা হচ্ছে ভরত মুনি অভিনয়ের প্রথম পাঠ শুরুই করেছেন আঙ্গিক দিয়ে। আঙ্গিক অর্থাৎ অঙ্গাভিনয়। দ্বিতীয় বাচিক অর্থাৎ কথা দিয়ে যে অভিনয়। তৃতীয় আহার্য অর্থাৎ মেক আপ, পোষাক, সেট, লাইট ইত্যাদি। চতুর্থ সাত্ত্বিক অর্থাৎ অভিনয়ের চরিত্রের সত্বায় পৌঁছনো। সেটা অনুভবের ধ্যানের জায়গা, কল্পনার জায়গা। প্রথম স্থান আঙ্গিক-এর। অর্থাৎ অঙ্গাভিনয়, শরীর দিয়ে অভিনয় – যার মধ্যে কোনও কথা নেই। কথা না বলার যে কথা অভিনয়ে থাকে অঙ্গ সঞ্চালনার মাধ্যমে – সেই অস্ত্রটা কিন্তু আমরা জন্ম থেকেই নিয়ে এসেছি। অর্থাৎ শরীর। আমার পরিবেশের আমার সমাজের আমার পরিবারের কিছু পরিচিত অঙ্গভঙ্গি দিয়ে অনেক কথা বলতে পারি। ধরুন কেউ যদি বড় বড় চোখ করে ভ্রু দু'টি কুঁচকায়, আমি সহজেই বুঝে যাবো আমার উপর রাগ করেছেন। অথবা কেউ যদি আলতো করে চোখের পাতা ফেলে আমাকে ডাকে আমি বুঝে যাবো তিনি স্নেহভরে আমাকে ডাকছেন। এগুলিই তো মূকাভিনয়। এখানে কথার কোন দরকার পড়ছে না। তাই সেই অর্থে মূকাভিনয়ের গভীরতা, প্রসারতা অনেক ব্যাপক। আমরা সাধারণ আমাদের বোধের সংকীর্ণতায় একটা ছোট জায়গায় মূকাভিনয়কে আটকে রেখেছি। প্যান্টোমাইমের কতগুলি স্টাইলাইজেশন আছে যেগুলোকে অদ্ভুতভাবে অঙ্গাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত করা যায়। যার শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন চার্লি চ্যাপলিন, বাস্টার কীটন, লরেল-হার্ডি, মার্ক্স-ব্রাদার্স এঁরা। উৎপল দত্ত'র অভিনয় স্কুলিং-এ চার্লি চ্যাপলিন, বাস্টার, কীটন, লরেল-হার্ডি, মার্ক্স-ব্রাদার্স এঁরা। উৎপল দত্ত'র অভিনয় স্কুলিং-এ চার্লি চ্যাপলিনে'র প্রভাব অসামান্য। তাঁর অভিনয় দর্শনের দিক থেকে, জীবন দর্শনের দিক থেকে, অথবা তাঁর যে পরিবেশনা। আপনারা যদি উৎপল দত্ত'র স্কুল অফ অ্যাক্টিং লক্ষ্য করেন সেখানে এই জায়গাটা আপনারা অনায়াসেই ধরতে পারবেন এবং সেই অঙ্গাভিনয় বা মূকাভিনয়ের জন্য যে সময় জ্ঞান 'Timing' অর্থাৎ ঠিক সময়ে ঠিক ভঙ্গিটি প্রকাশ করা; এই বিষয়ে উৎপল দত্ত ছিলেন সিদ্ধ নট এবং নাট্য পরিচালক। এখানে শুধুমাত্র একক অভিনয়ের ক্ষেত্রে নয়, অনেককে নিয়েও যখন দৃশ্য গঠন হচ্ছে সেখানেও। মনে করুণ আপনি একটি জানলার সামনে বসে আছেন সেখান থেকে বড়ো রাস্তাটা দেখা যাচ্ছে। আপনি মনে মনে তার সমস্ত Mute করে নিন। ধরুন একটা মিছিল আসছে, পুলিশ আটকাচ্ছে, কেউ পালাচ্ছে, কেউ আটকাতে আসছে, কেউ পড়ে যাচ্ছে, কেউ তাকে উদ্ধার করতে আসছে সেটা আপনি দেখতে থাকুন। দেখবেন সেখানে ব্যাপক মূকাভিনয় চলছে। এই জনগন;তার মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তির চলা – ফেরা, ভাব প্রকাশের স্বতন্ত্র রূপ আছে। সেই স্বতন্ত্রতা নিয়েই ওই ব্যাপক কান্ড ঘটছে। প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেই ঐ ব্যাপকতা সংঘটিত হচ্ছে। এই মূকাভিনয়টাই যখন থিয়েটার অঙ্গনে নিয়ে আসি তখন একটা বিশেষ মাত্রা যোগ হয়। আসলে এখানে একটা কথা বলা দরকার যে, থিয়েটার তো জীবন নয়। থিয়েটার হল জীবন থেকে নেওয়া ঘটনাবলীর উপস্থাপনার একটি আর্টিষ্টিক এক্সপ্রেশন। থিয়োটারে আমরা ২০ ঘন্টা ব্যাপী বিশাল একটা ঘটনাকে মাত্র ২ মিনিটে বা ৩ মিনিটে বিবৃত করি বা করতে পারি। তার জন্য অনেকগুলি আর্টিস্টিক এগজারেশন দরকার হয়। অনেক বিষয় কাটছাট করে দেবার দরকার হয় বা কমিয়ে দেবার দরকার হয়। এবং আরও ডেফিনিট করে দেখার জন্য স্পষ্ট ভঙ্গিমার দরকার হয়। এটাই সেই মূকাভিনয় – একটা বৃন্দগানের মতন। নানান বাদ্যযন্ত্রের নানান বৈচিত্রকে ব্যবহার করে একটি সিমফনির রূপ দিয়ে তার ভাব – তার রস আবেগ শ্রোতাদের কাছে অর্থপূর্ণ ভাবে পৌঁছে দেওয়া। কাজেই মূকাভিনয় মানেই যে একজন মুখে সাদা রঙ মেখে কালো টাইট পোশাক পরে নানারকম ব্যাপার স্যাপার দেখাতে লাগলেন এটা নয়। মূকাভিনয়ের ব্যাপ্তি এবং প্রসার অনেক দূর। আমরা তাকে বড়ো ছোট করে ফেলেছি।

আমার জীবনে মার্শেল মাস্ত্রে'র মূকাভিনয় দেখার সুযোগ হয়েছে। তিনিও প্যান্টোমাইমের ট্রাডিশনাল জায়গা থেকেই এসেছেন। কথা প্রসঙ্গে বলি আমাদের এখানে প্যান্টোমাইম বলে যা হয় এবং সেটিকে মাথায় তুলে যা নাচা হয়, কিন্তু মনে করো না, খুব সাদামাটা ভাবে বলতে পারি আমার মনে হয় ফচকেমি হচ্ছে। কিন্তু মাস্ত্রো'র মূক অভিনয় যখন দেখি তখন তাঁর উপস্থাপিত টাইটেলটা – সেই টাইটেলটা ছাড়িয়ে অনেক ব্যাপক এবং গভীর দর্শনের জায়গায় নিয়ে চলে যায়। তারজন্য তাঁর কোনও কথার বা শব্দরাজির দরকার পড়ে না। আমাদের দেশেও তার নিদর্শন আছে সেটা হচ্ছে কথক আঙ্গিকের। সেখানে মাইমের ব্যবহার অসামান্য। বিরজু মহারাজ'র কথক নৃত্য দেখেছি। সেখানে তিনি নৃত্য অর্থাৎ ডানদিকে যখন ফিরছেন কৃষ্ণ হচ্ছেন আবার বাঁদিকে যখন ফিরছেন রাধা হচ্ছেন। কৃষ্ণ থেকে যখন রাধা বা রাধা থেকেকৃষ্ণ হচ্ছেন তখন তাঁর চোখ মুখ শারীর বিভঙ্গ কি অসামান্য দক্ষতায় পাল্টে যাচ্ছে। তারজন্য তাঁর আলাদা করে রাধা বা কৃষ্ণের পোষাক বোঝাতে অনেক কষ্ট হয় না। শুধুমাত্র নাটকে নয় নৃত্যেও মূকাভিনয়ের প্রচুর প্রচুর ব্যবহার বা প্রয়োজনীয়তা আছে। উৎপল দত্ত সেটা খুব ভালো জানতেন এবং বুঝতেন। তাই আমাদের সেটি শিখিয়েছেনও। আমরাও আমদের নাট্যদল 'আখর'-এ সেইভাবে বহু প্রয়োজনাতে মূকাভিনয় মানে আমার নিজের করা বিভিন্ন নাট্য প্রযোজনা, 'শেক্সপীয়র', 'কলকাতার হ্যামলেট' থেকে শুরু করে বর্তমানে আমরা ব্যবহার করেছি। পাশ্চাত্যে থিয়েটার-এ একটা সময়ে শারীর বিভঙ্গের ব্যাপক ব্যবহার –মানে বায়োমেকানিজিম নিয়ে প্রচুর কাজ হয়েছে তাঁদের দেশের রাজনৈতিক সামাজিক আর্থিক এবং ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে সেইটির প্রয়োজনীয়তা ছিলো বা আছে। সেইটির একটি বিশেষ অর্থ আছে বা দ্যোতনা আছে। সেইটিকে নিয়ে যদি আমার ঘরে ট্রান্সপ্লান্ট করি কেবল মাত্র আঙ্গিক রচনার জন্য তার হুবহু অনুকরণ করি, আমাদের দেশ কালের সাংস্কৃতিক অভ্যাস বিস্মৃত হয়ে, বোধহয় ঠিক হবে না। বসরার মাটিতে গোলাপ যে রঙ দিয়েছে, যে গন্ধ দিয়েছে তা আমাদের এখানে দিতে পারে না বা দেয় না। এখানে

সেটা অর্থহীন হয়ে যায়। কারণ আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানে বসরার মাটির, আবহাওয়ার সঙ্গে আমাদের মাটির ফারাক অনেক।

আমি যদি এখানে টালা ব্রীজের ওপরে কৃষ্ণের মতো পা দু'টো ক্রশ করে হাতের মুদ্রার মধ্যে দিয়ে বাঁশি করে সেই বাঁশি ঠোঁটের পাশে রেখে দাঁড়িয়ে থাকি, ধরো এই রকম পোষাকেই, অর্থাৎ লুঙ্গি পাঞ্জাবী পরে যারা দেখবে বলবে বুড়ো লোকটা পাগল হয়ে গেছে, কৃষ্ণ সেজে বসে আছে। অর্থাৎ আমাদের দেশজ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার নিরিখে আমার অঙ্গভাষার সংকেত 'কৃষ্ণ' - কেউ বোঝাচ্ছে – এটা বুঝতে অসুবিধা নেই। সেই দেখে কোনোও বৃদ্ধ ভক্ত মানুষ বা বুড়ি মা হয়ত 'জয় কৃষ্ণ/ বলে আমার পায়ের কাছে একটা সিকি ফেলে দিয়ে চলে যাবে। কিন্তু এটা যদি কামসকাট্কায় গিয়ে আমি রাস্তায় অমনভাবে দাঁড়াই তাহলে হয়ত সেখানকার পুলিশ এসে আমায় ধরে নিয়ে চলে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই মূকাভিনয়ের ক্ষেত্রে এটাও স্মরণ রাখতে হয় কোন অঙ্গাভিনয় বা কোন আঙ্গিক সংকেত আমার সমাজের কাছে বোধগম্য। পাশ্চাত্যের শারীরিক অভিনয় বা আঙ্গিক সংকেত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের দর্শকদের কাছে কিন্তু পৌঁছায় না। আধুনিক পাণ্ডিত্য জাহির করার উদগ্র তাগিদে আমাদের এখানে এইরকম আহাম্মকী কান্ড প্রায়শই হয়। আবার আরেক দল আহম্মক তাদের মাথায় তুলে নাচেন। মূকাভিনয়ই হোক, নাটকই হোক, পালা অভিনয়ই হোক সেটা যদি তার সমাজের সাথে সম্পৃক্ত না থাকে অর্থাৎ সোজা কথায় 'আমি কার জন্য অভিনয় করি? আমার সমাজের জন্য, পারিপার্শ্বিকের জন্য, আমার পড়শির জন্য। তাঁদের কাছে যদি আমার অঙ্গ ভাষার অর্থ না পৌঁছায় –আমি কতো পন্ডিত তা জানিয়ে লাভ নেই। এই প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত'র 'টিনের তলোয়ার' নাটকের একটা সংলাপ মনে পড়ে গেল। সেখানে বেনীমাধব বলেন– 'একাদিক্রমে বিশ বছর অভিনয় করার পর জানতে পারলাম আমি অভিনয়ের কিছু বুঝি না। ''প্রিয়নাথ বলে –'তাহলে অভিনয় ছেড়ে দিলেন না কেন'? তখন বেনীমাধব বলেন 'ততদিনে বাংলার দর্শক আমাকে যে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার আসনে বসিয়ে দিয়েছে। 'এই রকম আহাম্মকি আমাদের দেশে নানাভাবে হয়। কাজেই সেগুলি সবই কমবেশী মেনে নিতে হবে। এখানে সাধারণত দেখি, সাধারণত দেখি কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি মূকাভিনয় মানেই কতগুলি ছোট্ট মামুলি বিষয়, যার মধ্যে সমাজের ব্যাপকতার মূল সমস্যা সংকট বা সমস্যার ছায়াপাত নেই। এক ব্যক্তির সুখ, দুঃখ, ফচকেমি, –এসবেরই হাস্যকর উপস্থাপনা ঘটে চলেছে। কিন্তু ব্যক্তির ঐ অনুভূতিগুলি যে সমাজের সংগত বা অসংগত অবস্থানের ফলশ্রুতি – তার হদিশ অধরা থেকে যায়। একই সমাজের অঙ্গ হয়েও তাঁর প্রকাশিত ভাবভঙ্গী আমার অন্তরকে নাড়া দিতে পারে না। যেই একক ব্যক্তির ভাব প্রকাশটি তাঁরই হয়ে আটকে যায় – আমার মধ্যে চারিয়ে যায় না। এক্ষেত্রে তাঁর অতীত skill–টাকেই বাহবা দেওয়া ছাড়া আর কিছু পাওয়ার থাকে না। তুমি স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করবে তাহলে মূকাভিনয়ের ভবিষ্যত কি? আমি বলবো এভাবে যদি চলে তবে এর ভবিষ্যত একেবারেই অন্ধকার। যে কোনও শিল্পের সৃজনের মূল কথা হচ্ছে সমাজ, মানুষ, দেশ, বিশ্বমানব। শিল্পী যদি তাঁর শিল্প সৃষ্টিতে সমকালীন ব্যথা, বেদনা, চাওয়া, পাওয়া, বঞ্চনা, অত্যাচারিত হওয়া, অত্যাচার এগুলি যদি ছুঁতে না পারে তবে কিসের শিল্প? কার কাদের জন্য শিল্প। একটা ছেলে একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে, প্রেমপত্র দিচ্ছে। প্রেমপত্র কি হচ্ছে – কতগুলি ফষ্টিনষ্টি হচ্ছে। তাতে আমার কি এসে যায়? আমার অর্থ, সময় ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যয় করে ওটা দেখতে যাবো কেন? মুকাভিনয় এত বড়ো একটা শক্তিশালী আঙ্গিক সেটা কেন সমাজের বৃহত্তর জায়গাটাকে ধরবে না? সেটা যদি ধরতে পারে এবং সেইখানে যদি নাড়া দিতে পারে তবে শত বিপর্যয় ঘটলেও 'মাইম'তার যোগ্য স্থানেই থাকবে। ভুলে গেলে চলবে না সব Performing Art –এর শেকড় এই 'মাইম'। আমার ধারণা যে কোনও আর্ট ফর্মেরই একটা জোয়ার ভাঁটার সময় থাকে এবং থাকবেই। কিন্তু এই শিল্পটাতো হারিয়ে যেতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'মাইম' শিল্পে এরকম আসবেই। সব হারিয়ে যাবে এটা তো হতে পারে না। মানব সভ্যতা তার শিল্প সংস্কৃতিকে তৈরী করেছে বা সৃষ্টি করেছে কোটি কোটি বছর ধরে বিন্দু বিন্দু করে দেশ, কাল, ভূগোল, ইতিহাস, ধর্ম, সংস্কার সব কিছুর থেকে নিয়ে নিয়ে। হঠাৎ সে উবে যাবে বা শেষ হয়ে যাবে বা কেউ তাকে শেষ করে দেবে এটা অবৈজ্ঞানিক চিন্তা। শেকড় যদি শক্ত থাকে তবে সে তার রূপ ঠিক খুঁজে নেবে। গ্রীস দেশের ডায়ানোসিয়াস উৎসবে 'কামোস' নামক যে ধারাটি কমেডি অভিনয়ের আদিরূপ বলে গ্রাহ্য, এক সময় সে প্রলায়ে হারিয়ে যেতে বসেছিল। কিন্তু কালের গতিতে সেই বীজ সে গ্রাম গ্রামান্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একসময় ইউরোপে 'কমেদিয়া দেল আর্তে' রূপে আপামর জনতার প্রাণের 'পালা' হয়ে উঠল। সেখানেও তো মূকাভিনয়ের চূড়ান্ত একটা জায়গা। সেখান কি? সেখানে সমস্ত চরিত্রগুলো মোটা দাগে তৈরী। যেমন –হাসি, কান্না, ক্রোধ ইত্যাদি। সেই সময় সেই রকমভাবে পরিবেশনা করার দরকার ছিলো বলেই সেইভাবে উপস্থাপনা হতো। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে যে, মানবতার বুনিয়াদী শিক্ষা কিন্তু থিয়েটার বা 'মুকাভিনয়' দিতে পারে। আরেকটা বিষয়ও শিল্পীদের পাশাপাশি মনে রাখা দরকার যে –এটা বললে হয়ত ওটা পাবো না, ওটা বললে হয়ত এটা পাবো না এতকিছু হিসেব করে কিন্তু শিল্প হয় না। চাটুকারিতা হয়। চাটুকার আর যাই হোক 'শিল্পী' হতে পারে না। যথার্থ 'শিল্পী' মানে একজন প্রকৃত 'মেরুদন্ডী'। থিয়েটারে একটা পর্যায়ের পর বাচিক আর কাজ করে না। অর্থাৎ কথায় আর ধরা যায় না। তখন ভিজ্যুয়ালি বিষয়টাকে নিয়ে আসতে হয়। ভিজ্যুয়ালটা কি? যতই টেকনিক্যালি আধুনিক চোখ ধাঁধানো দৃশ্য বলি বা আলো ব্যবহার করি না কেন, মানুষের শরীরের চেয়ে ভালো ভিজ্যুয়াল আর কিছু নেই। এটা উৎপল দত্ত-ও শিখিয়েছিলেন। এটাই মূকাভিনয়ের একটা বিশাল শক্তি। 'রাংতার মুকুট' নাটকে যেখানে নায়ক অভি রায়-কে ফাঁসী দেওয়া হয় – একটা সাইলেন্ট মুহূর্ত। ফাঁসীর দড়ি গলায় লাগালো। এক ধাক্কায় পায়ের তলার টেবিল সরে গেল। অভীর দেহটি ঝুলে পড়লো। পুরো হাউস আঁতকে উঠলো। অভী-র দেহটি ফাঁসির দড়িতে দোল খাচ্ছে। একটি বিশেষ আঙ্গিক অভিনয় ধরন যা শারীরিক ভঙ্গির মধ্যে দিয়ে প্রকাশ। এটি মূকাভিনয় চর্চা ছাড়া করা সম্ভব নয়। এই রকম বহু বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। খুব সাম্প্রতিক 'আখর' -এর প্রয়োজনা 'জান-এ-কলকাত্তা'। সেখানে একটা স্পেসকে ব্যবহার করা হয়েছে। গহরজান ঘোড়া হাঁকিয়ে যাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণভাবে মুকাভিনয়। আমার থিয়েটারে ফিজিক্যাল অ্যাকটিং -এর বিশেষ একটি জায়গা আছে। আমার নাটকে যেখানে কথা হারিয়ে যায়। তার উত্তরণের জন্য মূকাভিনয়ের আশ্রয় নিতেই হয়। মূক - অভিনয় অনেক অনেক কথা বলতে পারে। অনেকটা সাদা কালো ছবির মতো। সাদা কালো ছবিতে আমার মনের মতো রঙ দিয়ে দেখতে পারি। তুমি তোমার মনের মতো রঙ দিয়ে দেখতে পারো। আর একজন তার মনের মতো রঙ দিয়ে দেখতে পারে। কিন্তু রঙিন ছবিতে তা হওয়ার নয়। অর্থাৎ তোমায় যা দেখাচ্ছে তুমি তাই দেখছো। মাইম অ্যাকটিং-এর ক্ষেত্রেও এই যে ইমাজিনেশান –এর জায়গাটা অর্থাৎ আমি এক রকম ভেবে করছি দশ জন দর্শক দশ রকমভাবে ভাবছে নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মূকাভিনয়ের এই বিরাট জায়গা আছে, সেটা বাচিক অভিনয় করতে পারে না। অর্থাৎ সাদা কালো আর রঙিন ছবির যা পার্থক্য তাই।

মূকাভিনয় সেই অর্থে প্রচন্ড শক্তিশালী কল্পনা উদ্রেককারী এবং innovative শিল্প সৃজনের পরিমন্ডল রচনা করতে পারে প্রতি মূহূর্তে।